بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১ জুন ২০১৮, মোতাবেক ১ এহসান ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)। হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)-কে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হয়। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি অশ্বারোহে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেদিন তার তরবারি ভেঙে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাকে একটি কাঠের টুকরা দেন যা তাঁর হাতে অনেক ধারলো এবং নিখাঁদ লোহার তরবারিতে পরিণত হয়ে যায় আর তিনি সেটি দিয়েই যুদ্ধ করেন, এমন কি আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করেন। পরবর্তীতে এই তরবারি নিয়েই তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর এই কাঠের তরবারিটি মৃত্যু পর্যন্ত তার কাছেই ছিল। সেই তরবারির নাম ছিল 'অওন'। মহানবী (সা.) তাঁকে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ্, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫, উকাশা বিন মিহসান, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ,)** বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, আরবের সর্বোত্তম অশ্বারোহী আমাদের সাথে আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি কে? তিনি (সা.) বলেন, উকাশা বিন মিহসান। **(বৈরুত থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্)**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মত থেকে একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত উকাশা বিন মিহসান তখন নিজের চাদর তুলে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। এরপর আনসারদের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, **'সাবাক্বাকা বিহা উকাশা'** অর্থাৎ, এক্ষেত্রে উকাশা তোমার চেয়ে এগিয়ে গেছে। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়ঃ আদ দালিলু আলা দুখুলি তাওয়ায়িফি মিনাল মুসলিমিনাল জান্নাতা বিগাইরি হিসাবিন ওয়ালা আযাবিন, হাদীস নং: ৩৬৯)**

এই ঘটনাটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তার সীরাত গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে কথার উল্লেখ করা হয় যে, আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তারা এমন ঐশী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে আর তাদের জন্য ঐশী দয়া ও কৃপা এত বেশি উদ্বেলিত হবে যে, তাদের কোন প্রকার হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন হবে না। তিনি (সা.) একথাও বলেন, তাদের চেহারা কেয়ামতের দিন এমনভাবে ঝলমল করবে যেভাবে চতুর্দশী চাঁদ আকাশে ঝলমল করে।

তখন হযরত উকাশা (রা.) নিবেদন করেন, (হে আল্লাহ্‌র রসূল) আমার জন্যও দোয়া করুন আর তিনি (সা.) দোয়া করেন যেন তাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) খুবই সুন্দরভাবে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন এবং বিশ্লেষণও করেছেন। তিনি (রা.) লিখেছেন, এটি বাহ্যত মহানবী (সা.)-এর বৈঠকের ছোট্ট একটি ঘটনা হলেও এর মাঝে রয়েছে তত্ত্বজ্ঞানের এক ভাণ্ডার। প্রথমত এখেকে এই জ্ঞান অর্জিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এত বেশি দয়া এবং কৃপা রয়েছে আর মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ এত উন্নত মানের যে, তাঁর উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ এমন হবেন যারা নিজেদের উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং খোদা তা'লা বিশেষ দয়া ও কৃপার কারণে কিয়ামত দিবসে হিসাবনিকাশের চিন্তার উর্ধ্বে থাকবে। (সত্তর হাজার দ্বারা এক বৃহৎ সংখ্যাও বুঝাতে পারে)। দ্বিতীয়ত এ থেকে এ বিষয়টিও জানা যায়, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এত নৈকট্যের অধিকারী যে, তাঁর ঐশী মনোযোগের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষনাৎ কাশ্‌ফ বা এলকা'র মাধ্যমে তাঁকে এই জ্ঞান দান করেন যে, উকাশাও সেই সত্তর হাজারী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে আর এটিও হতে পারে যে, উকাশা ইতোপূর্বে এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না কিন্তু তাঁর (সা.) দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই সম্মান দান করেছেন। তৃতীয়ত এই ঘটনা থেকে এটিও জানা যায়, মহানবী (সা.) খোদা তা'লার সম্মানের প্রতি এত বেশি দৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি তাঁর উম্মতের মাঝে চেষ্টা-সাধনা অর্থাৎ আমলকে এত বেশি উন্নতি দিতে চেয়েছিলেন যে, উকাশার পর দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে একই ধরনের দোয়ার অনুরোধ করলে তিনি পবিত্র-দলভুক্ত লোকদের অর্জিত ঐশী মর্যাদা লাভের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে একক ব্যক্তির জন্য আরো দোয়া করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি তাকওয়া, ঈমান এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, এদিকে দৃষ্টি থাকলে তোমরা এই মর্যাদা লাভ করতে পারবে। চতুর্থত এর ফলে মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিষয়টিও অসাধারণভাবে দেদীপ্যমান হয়। কেননা তিনি (সা.) এমনভাবে অস্বীকার করেন নি যার ফলে দোয়াপ্রার্থী সেই আনসারীর মনে কষ্ট লাগে বরং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে এ বিষয়টি এড়িয়ে যান। **[হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৬৬৭-৬৬৮]**

মহানবী (সা.) হযরত উকাশা (রা.)-কে বিভিন্ন সারিয়ায় [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অংশগ্রহণ না করা যুদ্ধ বা অভিযানে] বা যুদ্ধে যেসব বাহিনী প্রেরণ করা হতো সেগুলোর সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত উকাশা (রা.)-কে ৪০জন মুসলমানের নেতা হিসেবে বনু আসাদ গোত্রের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। এই গোত্র গামার নামক একটি ঝর্ণার কাছে বসতি স্থাপন করে রেখেছিল, যা ছিল মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী পথে কয়েক দিনের দূরত্বে অবস্থিত। উকাশা (রা.)'র দল দ্রুত পথ পাড়ি দিয়ে তাদের নিকটে পৌঁছে যায় যেন তাদেরকে অনিষ্ট থেকে বিরত রাখা যায়। তখন জানা যায়, এই গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে। তখন উকাশা (রা.) এবং তার সহচরগণ মদীনায় ফিরে আসেন ফলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। **[হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৬৬৬]** যদিও অপবাদ আরোপ করা হয়, কাহান বা মুসলমানদের (বিনা কারণে) যুদ্ধ করার শখ ছিল। অথচ তারা বিনা কারণে যুদ্ধ করার কোন চেষ্টাও করেন নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন সূরা আন্ নাসর অবতীর্ণ হয় তখন তিনি (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। নামাযের পর তিনি (সা.) একটি খুতবা প্রদান করেন যা শুনে মানুষ অনেক বেশি কান্নাকাটি করে। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে লোক সকল! আমি কেমন নবী? তখন তারা উত্তরে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আপনি আমাদের জন্য পরম দয়ালু পিতার ন্যায় এবং স্নেহপরায়ণ উপদেশদাতা ভাইয়ের তুল্য, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর ওহী নিয়ে এসেছেন আর প্রজ্ঞা ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে আমাদেরকে আপনি নিজ প্রভুর পথ-পানে আহ্বান করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন যা তিনি তাঁর নবীদের দান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে মুসলমানদের দল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও আপন অধিকারের কসম দিয়ে বলছি, যদি আমার পক্ষ থেকে কারও প্রতি যদি কোন অত্যাচার বা অবিচার হয়ে থাকে তাহলে সে দণ্ডায়মান হোক এবং আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক কিন্তু কেউ দাঁড়ায় নি। তিনি (সা.) দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে একই কথা বলেন কিন্তু কেউ দাঁড়ায় নি। তিনি (সা.) তৃতীয়বার বলেন, হে মুসলমানদের দল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং তোমাদের ওপর নিজের অধিকারের কসম দিয়ে বলছি, যদি কারও প্রতি আমার পক্ষ থেকে কোন অবিচার বা অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে যেন দাঁড়ায় এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিশোধের পূর্বেই আমার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তখন লোকদের মাঝ থেকে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দাঁড়ায়, যার নাম ছিল উকাশা (রা.)। তিনি মুসলমানদের ভিড় ঠেলে সম্মুখে এগিয়ে যান, এমনকি মহানবী (সা.)-এর মুখোমুখি দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, যদি আপনি বারবার কসম না দিতেন তাহলে আমি কখনোই উঠে দাঁড়াতাম না। হযরত উকাশা (রা.) বলেন, একবার আমি আপনার যুদ্ধসঙ্গী ছিলাম, সেখান থেকে ফেরার পথে আমার উটনী আপনার উটনীর নিকটে চলে আসে তখন আমি আমার বাহন থেকে নেমে আপনার নিকটে আসি যেন আপনার পায়ে চুমু খেতে পারি কিন্তু আপনি আপনার হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন যা আমার পার্শ্বদেশে লাগে, সেই লাঠি আপনি উটনীর গায়ে মেরেছিলেন নাকি আমাকে – তা আমি নিশ্চিত নই? তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপের কসম! খোদার রসূল ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই তোমাকে মারতে পারে না। এরপর তিনি (সা.) হযরত বেলালকে সম্বোধন করে বলেন, হে বেলাল! ফাতেমার ঘরে যাও আর তার কাছ থেকে সেই লাঠি নিয়ে আস। হযরত বেলাল (রা.) গিয়ে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বলেন, হে মহানবী (সা.)-এর আদরের দুলালী! আমাকে সেই লাঠি দিন। তখন ফাতেমা (রা.) বলেন, হে বেলাল! আমার পিতা এই লাঠি দিয়ে কি করবেন? এটি যুদ্ধের পরিবর্তে হজ্জের দিন নয় কি? তখন হযরত বেলাল (রা.) বলেন, হে ফাতেমা (রা.)! আপনি দেখছি আপনার পিতা মহানবী (সা.) সম্পর্কে কিছুই জানেন না। মহানবী (সা.) তো মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আর মানুষকে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বলছেন। তখন হযরত ফাতেমা (রা.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে বেলাল! মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে কার মন চাইবে? এরপর তিনি বলেন, হে বেলাল! হাসান এবং হোসেইনকে বল, তারা যেন সেই ব্যক্তির সামনে দণ্ডায়মান হয় এবং তাদের কাছ থেকে

প্রতিশোধ নিতে বলে আর সেই ব্যক্তিকে মহানবী (সা.) থেকে প্রতিশোধ নিতে না দেয়। এরপর হযরত বেলাল (রা.) মসজিদে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে সেই লাঠি দেন আর তিনি (সা.) সেই লাঠি উকাশা (রা.)'র হাতে তুলে দেন। এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) উভয়েই দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলেন, হে উকাশা! আমরা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও এবং মহানবী (সা.)-কে কিছু করো না। তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আবু বকর এবং উমর! তোমরা থাম, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উভয়ের মর্যাদা জানেন। এরপর হযরত আলী (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন, হে উকাশা! আমি আমার সারা জীবন মহানবী (সা.)-এর সাথে কাটিয়েছি, মহানবী (সা.)-কে তুমি আঘাত করবে– এটি আমার হৃদয় কখনোই সহ্য করতে পারবে না। অতএব এই নাও আমার দেহ, তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নাও এবং নির্দ্বিধায় আমাকে শতবার আঘাত কর কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিও না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আলী! বসো, আল্লাহ্ তা'লা তোমার নিয়্যত এবং মর্যাদা সম্বন্ধে জানেন। এরপর হযরত হাসান এবং হোসেইন দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে উকাশা! আমরা মহানবী (সা.)-এর দৌহীত্র আর আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার নামান্তর। তিনি (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আমার প্রিয়রা! বসে যাও। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে উকাশা! আঘাত কর। হযরত উকাশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যখন আমাকে আঘাত করেছিলেন তখন আমার পেটের ওপর কাপড় ছিল না, তখন তিনি (সা.) নিজের পেটের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নেন, এতে মুসলমানরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলে, উকাশা কি সত্যি সত্যিই মহানবী (সা.)-কে আঘাত করবে? কিন্তু হযরত উকাশা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর দেহের শুভ্রতা দেখেন তখন তিনি পাগলপারা হয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং তাঁর (সা.) দেহে চুমু খেতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার হৃদয় চাইবে যে, সে আপনার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে? তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি প্রতিশোধ নিবে নাকি ক্ষমা করবে? তখন হযরত উকাশা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি এই আশায় ক্ষমা করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন। তখন তিনি (সা.) মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সঙ্গী দেখতে চায় সে যেন এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে নেয়। অতএব মুসলমানরা উঠে দাঁড়িয়ে হযরত উকাশা (রা.)'র মাথায় চুমু খেতে থাকে এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, তুমি অনেক উন্নত মর্যাদা লাভ করেছ এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ লাভ করেছ। **(২০০১ সনে বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৪২৯-৪৩১, কিতাব আলামাতিন নবুয়্যঅত, হাদীস নং১৪২৫৩)** অতএব এই ছিলেন হযরত উকাশা (রা.)। তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগান, কী জানি আবার কখনো এ সুযোগ পাওয়া যায় কিনা, মহানবী (সা.) তো তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিচ্ছেন তাই তিনি ভাবলেন, এটিই সুযোগ, জীবিত থাকতেই তাঁর (সা.) দেহকে শুধুমাত্র চুমুই খাব না বরং আদরও করব।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে হযরত উকাশা (রা.) মুরতাদদের শিরোচ্ছেদের জন্য রওয়ানা হন, ঈসা বিন উমায়লা তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মানুষের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় যদি আযান শুনতেন তখন আক্রমন করতেন না আর যদি আযান না

শুনতেন তাহলে আক্রমন করতেন। তিনি (রা.) যখন সেই জাতির কাছে পৌঁছেন যারা বুযাখা নামক স্থানে ছিল, তখন তিনি হযরত উকাশা বিন মিহসান এবং হযরত সাবেত বিন আকরামকে শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, হযরত উকাশা (রা.)'র ঘোড়ার নাম ছিল **আর্ রাযাম** আর হযরত সাবেতের ঘোড়ার নাম আল্ **মুহাব্বার**। তাদের উভয়ের মোকাবিলা হয় তুলায়হা এবং তার ভাই সালামার সাথে যারা মুসলমানদের (বিরুদ্ধে) গুপ্তচরবৃত্তির অভিপ্রায়ে নিজ বাহিনীর পূর্বে এসে গিয়েছিল। তুলায়হার মোকাবিলা হয় হযরত উকাশা (রা.)'র সাথে আর সালামার মোকাবিলা হয় হযরত সাবেত (রা.)'র সাথে আর এই উভয় ভাই−ই সেই দু'জন সাহাবীকে শহীদ করে। আবু ওয়াকেদ লাইসি বর্ণনা করেন, আমরা দুই'শ অশ্বারোহী বাহিনীর সম্মুখভাগে চলছিলাম। আমরা এই উভয় নিহত অর্থাৎ হযরত সাবেত এবং হযরত উকাশা (রা.)'র পাশে দাঁড়িয়ে থাকি এমন কি হযরত খালেদ আসেন এবং তার নির্দেশে আমরা হযরত সাবেত এবং হযরত উকাশা (রা.)-কে রক্তরঞ্জিত কাপড়েই দাফন করি। এই ঘটনা বারো হিজরী সনের, এভাবে তাদের শাহাদাত হয়। **(১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল এহয়িয়াতুত্ তারাসুল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫, সাবেত বিন আকরাম)**

হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত খারেজা বিন জায়েদ (রা.) ছিল খাযরাজ গোত্রের আগার্ গোত্রের সদস্য। হযরত খারেজা (রা.)'র কন্যা হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন, যার গর্ভে হযরত উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। মহানবী (সা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি গোত্রের নেতা ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে তাকে গণ্য করা হতো। তিনি উকবায় বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। **(১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল এহয়িয়াতুত্ তারাসুল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭১, ওয়া মিন বানি আলহারেস ... খারেজা বিন যায়েদ)** মদীনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। **(২০০৩ সনে বৈরুতের আল্ ফিকর প্রেস থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪০)** তিনি অর্থাৎ হযরত খারেজা (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশ নেন আর উহুদের যুদ্ধে পরম সাহসিকতা এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বর্শাবিদ্ধ হন এবং তার গায়ে তেরোটির অধিক আঘাত লাগে। তিনি আহত অবস্থায় নিষ্প্রাণের মতো পড়েছিলেন এমন সময় সাফ্‌ফান বিন উমাইয়া তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দেখে চিনতে পারে আর আক্রমন করে তাকে শহীদ করে। আর তার লাশও বিকৃত করে এবং বলে, এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বদরের যুদ্ধে আবু আলী অর্থাৎ আমার পিতা উমাইয়্যা বিন খালফকে হত্যা করেছিল। আজ আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে উত্তম লোকদের হত্যা করার এবং নিজের হৃদয় প্রশান্ত করার সুযোগ পেয়েছি। সে হযরত ইবনে কাউকাল, হযরত খারেজা বিন যায়েদ এবং হযরত অউস বিন আরকাম (রা.)-কে শহীদ করে। হযরত খারেজা এবং হযরত সাদ বিন রাবি (রা.) তার চাচাত ভাই ছিলেন, তাদের উভয়কে একই কবরে সমাহিত করা হয়।" **{২০০২ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত আল্ ইসতি'আব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৩-৪, খারেজাহ বিন যায়েদ (রা.)}** বর্ণিত আছে, উহুদের দিনে হযরত আব্বাস বিন উবাদা উচ্চস্বরে বলছিলেন, হে

মুসলমানের দল! আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীর সাথে সংযুক্ত থাক, তোমরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা তোমাদের নবীর কথা অমান্য করার কারণে হয়েছে। তিনি তোমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ কর নি। এরপর হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) নিজের শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম খুলে ফেলেন এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার এর প্রয়োজন আছে কি? হযরত খারেজা (রা.) বলেন, না, তুমি যে জিনিসের আকাঙ্খা কর সেই একই জিনিস আমিও চাই। এরপর তারা সবাই শত্রুর সাথে লড়াই আরম্ভ করেন। আব্বাস বিন উবাদা (রা.) বলেন, আমাদের চোখের সামনে যদি মহানবী (সা.) কোন আঘাত পান বা কোন কষ্ট পান তাহলে আমরা নিজেদের প্রভুর কাছে কী জবাব দিব? আর হযরত খারেজা (রা.) বলতেন, আমাদের প্রভুর কাছে আমাদের কোন অজুহাতও থাকবে না আর কোন দলীলও থাকবে না। হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.)-কে সুফিয়ান বিন আব্দে শামস সালামা শহীদ করে এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদের দেহে দশটির অধিক আঘাত লাগে।

(বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত কিতাবুল মাগাযী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২৭-২২৮, বাবঃ গাযওয়ায়ে উহুদ)

উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.), হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। হযরত খারেজা (রা.) আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। তার তেরটির মত গুরুতর আঘাত লেগেছিল। হযরত মালেক (রা.) তাকে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে? হযরত খারেজা (রা.) বলেন, তাঁকে শহীদ করা হলেও আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতরূপে জীবিত আছেন আর তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। মহানবী (সা.) বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। (অতএব) তুমিও তোমার ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ কর। **(বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত কিতাবুল মাগাযী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩, বাবঃ গাযওয়ায়ে উহুদ)**

হযরত খারেজা (রা.)'র দু'জন সন্তান ছিল। তাদের একজন ছিলেন হযরত যায়েদ বিন খারেজা যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খারেজা বিন যায়েদ–এর দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা, যার বিবাহ হয় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তার স্ত্রী হযরত হাবীবা গর্ভবতী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, আমি তার গর্ভে কন্যা সন্তানের আশা করি। বাস্তবেও তার ঘরে কন্যা সন্তানই জন্মগ্রহণ করে। **(২০০৩ সালে বৈরুতের দারুল ফিক্‌র থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪০-৬৪১, খারেজাহ বিন যায়েদ)**

এরপর মহানবী (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ (রা.)। তাঁর মাতার নাম ছিল আমরা বিনতে আবিদ মাতরুফ। হযরত যিয়াদ (রা.)'র এক পুত্র ছিলেন আব্দুল্লাহ্। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় সত্তরজন সাহাবীর সাথে তিনি উপস্থিত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন তিনি এসেই স্বীয় মূর্তিপূজক গোত্র বনু বায়াযা'র প্রতিমাসমূহ ভেঙে ফেলেন। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কায় চলে যান আর সেখানেই অবস্থান করেন, এমনকি মহানবী (সা.) যখন মদীনার অভিমুখে হিজরত করেন তখন তিনিও তাঁর

(সা.) সাথে হিজরত করেন। তাই হযরত যিয়াদ (রা.)-কে মুহাজির আনসারী বলা হয়। তিনি একাধারে মুহাজির এবং আনসারও ছিলেন। হযরত যিয়াদ (রা.) বদর, উহুদ, খন্দক এবং সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। **(১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল এহয়িয়াতুত্ তারাসুল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০২, সাবেত বিন আকরাম)** মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর যখন বনু বায়াযা গোত্রের মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন হযরত যিয়াদ (রা.) তাঁকে (সা.) সুস্বাগত জানান এবং নিজ বাড়িতে অবস্থানের অনুরোধ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার উটনীকে মুক্ত ছেড়ে দাও, সে নিজেই নিজের গন্তব্য খুঁজে নিবে।

নবম হিজরীর মহররম মাসে মহানবী (সা.) সদকা এবং যাকাত সংগ্রহের জন্য পৃথক পৃথক সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। তখন হযরত যিয়াদ (রা.)-কে 'হাযরে মওত' এলাকার সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা.)'র যুগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। এই দায়িত্ব পালন শেষে তিনি কুফায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং সেখানেই ৪১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। **(১৯৮৫ সালে লাহোরের মেট্রো প্রিন্টার্স থেকে প্রকাশিত সরওয়ারে কায়েনাত কে পচাস সাহাবা, রচয়িতা তালেবুল হাশেমী, পৃঃ ৫৫৭-৫৫৯)**

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন ধর্ম-ত্যাগের নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন আশআস বিন কায়েসুল কান্দিও ধর্মত্যাগ করে। তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য হযরত যিয়াদ (রা.)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি যখন তার ওপর হামলা করেন তখন সে 'নাহীর' দুর্গে আশ্রয় নেয়। হযরত যিয়াদ (রা.) তাকে কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখেন, এমনকি সে অতিষ্ঠ হয়ে এই বার্তা প্রেরণ করে যে, আমাকে সহ আরও নয়জনকে নিরাপত্তা দেয়া হলে আমি দুর্গের দরজা উন্মুক্ত করে দিব। হযরত যিয়াদ (রা.) বলেন, চুক্তিপত্র লিখে নিয়ে আস, আমি তার ওপর সত্যায়ন করে দিব। এরপর সে দরজা খুলে দেয়। পরে যখন সেই চুক্তিপুত্র দেখা হয় তখন দেখা যায়, অন্য নয় ব্যক্তির নাম লেখা হলেও সে নিজের নাম লিখতেই ভুলে গেছে। অতএব তাকে অন্যান্য বন্দির সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়। **(১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত ইমতাউল আসমা', চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২৫৪-২৫৫)**

এরপর মহানবী (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত মুয়াত্তেব বিন উবায়েদ (রা.)। তার কোন সন্তান ছিল না। তার ভাতিজা উসায়ের বিন উরওয়া তার উত্তরাধিকারী হন। হযরত মুয়াত্তেব বিন উবায়েদ (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নেন এবং 'ইয়াওমুর রাজী'তে শাহাদত বরণ করেন। **(১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়ায়িত তারাসুল্ আরাবী থেকে প্রকাশিত আত তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪০, ওয়া মিন হুলাফাঈ বনী যাফর)** রাজীর ঘটনায় দশজন মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, "এ দিনটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত শংকার দিন ছিল এবং চতুর্দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর কাছে ভীতিপ্রদ সংবাদ আসছিল। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত ছিলেন মক্কার কুরাইশদের বিষয়ে, যারা উহুদের যুদ্ধের কারণে অনেক সাহসী ও উদ্ধত হয়ে উঠছিল। এই শংকাটি আঁচ করতে পেরে মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে তাঁর দশজন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করেন এবং তাদের ওপর আহসান বিন সাবেত (রা.)-কে

আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন চুপিসারে মক্কার কাছে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে (সা.) সংবাদ দেয়। কিন্তু এই দলটির যাত্রা করার পূর্বেই ‘আযাল’ এবং ‘কারাহ্’ গোত্রের কয়েকজন লোক তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমাদের গোত্রে অনেক মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। আপনি আমাদের সাথে কয়েকজনকে প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে মুসলমান বানাবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে। মহানবী (সা.) তাদের এই আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে সেই একই দল যেটিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তা তাদের সাথে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি পরবর্তীতে জানা গেছে যে, এরা মিথ্যাবাদী ছিল এবং বনু লেহইয়ানের উসকানিতে মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছিল যেন এই সুযোগে মুসলমানরা মদীনা থেকে বের হলে তাদের ওপর আক্রমণ করা যায়। আর বনু লেহইয়ান এই কাজের বিনিময়ে আযাল এবং কারাহ্’র লোকদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ অনেক উট নির্ধারণ করে রেখেছিল। আযাল এবং কারাহ্’র এই বিশ্বাসঘাতক লোকেরা যখন আসফান এবং মক্কার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে তখন তারা গোপনে বনু লেহইয়ান গোত্রের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, মুসলমানরা আমাদের সাথে আসছে, তোমরা চলে আস। তখন বনু লেহইয়ানের দুইশ’ যুবক, যাদের মাঝে একশজন তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয় আর রাজী’ নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলে। দশজন মানুষ দুইশ’ সৈন্যের কী করে মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু মুসলমানদের অস্ত্রসমর্পনের শিক্ষা দেয়া হয় নি। যদি এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তোমাদেরকে যখন ঘিরে ফেলা হয় তখন নির্দেশ হল, যুদ্ধ কর। অতএব সেই সাহাবীরা ত্বরিৎ নিকটস্থ একটি টিলায় উঠে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কাফিররা, যাদের কাছে প্রতারণা করা কোন দোষণীয় কাজ ছিল না, তাদেরকে ডেকে বলে, তোমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে আস– আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার করে বলছি, তোমাদেরকে হত্যা করব না। আসেম (রা.) তখন উত্তরে বলেন, আমরা তোমাদের এই অঙ্গীকার বিশ্বাস করি না, আমরা তোমাদের এই দায়িত্বের কথায় (নিচে) নেমে আসতে পারি না। এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, তুমি তোমার রসূলের কাছে আমাদের এই অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দাও। মোটকথা আসেম (রা.) এবং তার সঙ্গীরা তাদের মোকাবিলা করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যখন সাতজন সাহাবী নিহত হন এবং শুধুমাত্র খোবায়েব বিন আদি ও যায়েদ বিন দাসেনা এবং আরো একজন সাহাবী বাকি রয়ে যান, তখন কাফিররা যাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে জীবিত পাকড়াও করা– পুনরায় তাদেরকে ডেকে বলে, এখনও নিচে নেমে আস, আমরা অঙ্গীকার করছি যে, তোমাদেরকে কোন কষ্ট দিব না। এবার এই সরলপ্রাণ মুসলমানরা তাদের ফাঁদে পা দিয়ে নিচে নেমে আসেন, কিন্তু নিচে আসা মাত্রই কাফিররা তাদের তিরধনুকের রশি দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। এতে খোবায়েব এবং যায়েদ (রা.)’র সঙ্গী, যার নাম ইতিহাসে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক উল্লেখ হয়েছে, তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি, তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন, এটি তোমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আর জানা নেই যে, সামনে গিয়ে তোমরা আরো কী কী করবে? অতএব আব্দুল্লাহ্ তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। তখন কাফিররা আব্দুল্লাহ্‌কে কিছু দূর পর্যন্ত টেনেহিঁচড়ে জোরপূর্বক নিয়ে যায় এবং এরপর তাকে হত্যা করে

সেখানেই ফেলে রাখে। আর যেহেতু তাদের প্রতিশোধ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাই কুরাইশকে খুশি করার জন্য এবং সেই সাথে অর্থের লোভে খোবায়েব ও যায়েদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে মক্কার অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌঁছে তাদেরকে কুরাইশের কাছে বিক্রি করে দেয়। খোবায়েব (রা.)-কে হারেছ বিন আমর বিন নওফেলের ছেলে কিনে করে নেয়। কেননা বদরের যুদ্ধে খোবায়েব (রা.) হারেছকে হত্যা করেছিলেন এবং যায়েদ (রা.)-কে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ক্রয় করে। অবশেষে তাদেরকেও শহীদ করা হয়। **(মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এম,এ, রচিত সীরাত খাতামান নবীঈন, পৃঃ ৫১৩-৫১৪)**

এরপর বদরী সাহাবীদের মাঝে আরেকজনের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি হলেন, হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)। হযরত খালেদ বিন বুকায়ের, হযরত আকেল, হযরত আমের এবং হযরত আইয়্যাস (রা.) একত্রে দ্বারে আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর এই চার ভাই দ্বারে আরকামে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত খালেদ বিন বুকায়ের এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনা (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং পূর্বল্লোখিত রাজী'র ঘটনায় শহীদ হন, যেখানে দশজন সাহাবীকে প্রতারণার মাধ্যমে শহীদ করা হয়েছিল। **[১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল্ কুতুবিল ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭, আকেল বিন আবিল কাবির (রা.), খালিদ বিন আবিল কাবির (রা.)]** বদরের যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্হাশ (রা.)'র নেতৃত্বে একটি সেনাদল কুরাইশের কাফেলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এতে হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে চৌত্রিশ বছর বয়সে রাজী'র যুদ্ধে আসেম বিন সাবেত এবং মারসাদ বিন আবি মারসাদ গানাবী'র সাথে আযাল ও কারাহ্ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। **[২০০৩ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭, খালিদ বিন বাকায়ের (রা.)]**

এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেন, যখন আযাল এবং কারাহ্ গোত্রের লোকেরা এই সাহাবীদের নিয়ে রাজী' নামক স্থানে পৌঁছে, যা উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম। রাজী' একটি জায়গা যা উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম এবং হেজাযের পাশে অবস্থিত। তখন সেই লোকেরা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থাৎ যারা তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ধোঁকা দেয় এবং হুযায়েল গোত্রকে তাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। সাহাবীরা তাদের তাঁবুতে থাক অবস্থায়ই দেখেন যে, চতুর্দিক থেকে মানুষ তরবারি হাতে নিয়ে তাদের দিকে আসছে। তখন তারাও বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সেই লোকেরা (অর্থাৎ কাফিররা) বলে, খোদার কসম! আমরা তোমাদের হত্যা করব না। আমরা শুধু তোমাদেরকে ধরে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যেতে চাই এবং তাদের কাছ থেকে তোমাদের বিনিময়ে কিছু নিয়ে নিব। হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.), হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.) এবং হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমরা মুশরিকদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি না। অবশেষে এই তিনজনই যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। **(২০০১ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৯১-৫৯২, যিকরে ইয়াওমির রাজি' ফি সুন্নাতি সালাস)**

হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রা.) তাদের সম্পর্কে নিজের এক পঙ্ক্তিতে লিখেন,

أَلا لَيتَني فيها شَهِدتُ ابنَ طارِقٍ
وَزَيداً وَما تُغني الأَمانِي وَمَرثَدا
فَدافَعتُ عَن حِبِّي خُبَيبٍ وَعاصِمٍ
وَكانَ شِفاءً لَو تَدارَكتُ خالِدا

(উচ্চারণ: 'আলা লায়তানী ফিহা শাহেদতু বনা তারেক
ওয়া যায়দান ওয়ামা তুগনিল আমানী ওয়া মুরসাদা
ফাদাফা'তু আন হিব্বী খুবায়বিন ওয়া আসেম
ওয়া কানা শিফাউন লাউ তাদারাকতু খালেদা')

[২০০৩ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৬৪৭, খালিদ বিন বুকায়ের (রা.)]

অর্থাৎ **হায়! আমি যদি এই (রাজী'র ঘটনার) সময় ইবনে তারেক এবং যায়েদ এবং মুরসাদের সাথে থাকতাম, যদিও আকাঙ্ক্ষা কোন কাজে আসে না তবুও আমি আমার বন্ধু খুবায়েব এবং আসেমকে রক্ষা করতে পারতাম। আর যদি আমি খালেদকে পেয়ে যেতাম, তাহলে সেও বেঁচে যেত।**

অতএব, এরা ছিলেন সেসব পুণ্যাত্মা, যারা ধর্মের সুরক্ষার খাতিরে এবং নিজেদের ঈমানের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কুরবানী দিয়েছেন আর অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক রচনায় লিখেন,

'সেই অনুগ্রহশীল খোদার কৃতজ্ঞতা, যিনি অনুগ্রহকারী এবং দুঃখ বিমোচনকারী। আর তাঁর রসূলের ওপর দরূদ ও সালাম, যিনি মানব এবং জিনদের ইমাম এবং পবিত্র হৃদয় আর বেহেশতের দিকে আকর্ষণকারী। আর তাঁর সেসব সাহাবীর প্রতি সালাম, যারা ঈমানের ঝর্ণাধারার প্রতি তৃষ্ণার্তের ন্যায় দৌঁড়ে গেছেন এবং অজ্ঞতার অমানিশার রাতে জ্ঞান এবং আমলের উৎকর্ষে আলোকিত হয়েছেন।' (নুরুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, অষ্টম খণ্ড, পৃ: ১৮৮)

অপর একস্থানে সাহাবীদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **'তারা দিনের বেলা (যুদ্ধ) ক্ষেত্রে সিংহ এবং রাতের রাহেব এবং ধর্মের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন (রাতের রাহেব হওয়ার অর্থ হল, তারা রাতে ইবাদতকারী আর ধর্মের তারকা)। তাদের সবার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট।' (নজমুল হুদা, রূহানী খাযায়েন, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ: ১৭)** আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও নিজেদের জ্ঞান এবং কর্মগত অবস্থাকে উন্নত করার এবং রাতের ইবাদতের মান উন্নত করার তৌফিক দান করুন।

জুমুআর পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, যা উগান্ডার মুবাল্লিগ মুকার্‌রম ইসমাঈল মালাগালা সাহেবের। তিনি গত **২৫** মে **২০১৮** তারিখে জুমুআর নামাযের পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে নিজ প্রভুর সাথে মিলিত হন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ইসমাঈল মালাগালা সাহেব **১৯৫৪** সনে উগান্ডার মাকুনু জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার

পিতামাতা উভয়ে খ্রিষ্টান ছিলেন। যে কারণে তিনিও জন্মগতভাবে খ্রিষ্টান ছিলেন। মালাগালা সাহেব আহমদী এক বন্ধু হাজী শোয়েব নাসীরা সাহেবের শ্যালক ছিলেন, তাই হাজী শোয়েব সাহেবের বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। হাজী শোয়েব সাহেবের মাধ্যমেই ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক দীর্ঘকাল প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে তার কাছে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে, আর অবশেষে ১৯৭৮ সনে তিনি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হাজী শোয়েব নাসিরা সাহেবের কাছে বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই খ্রিষ্টান যাজক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতাম। এখন যেহেতু আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাই আমি কি ইসলামের কোন সেবা করতে পারি? তখন তাকে বলা হয়, আপনি ইসলামের সেবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তখন (উগাণ্ডা জামাতের বর্তমান আমীর) মোহাম্মদ আলী কায়রে সাহেব, পাকিস্তান থেকে জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা সম্পন্ন করে উগান্ডা ফিরেছিলেন। অতএব তিনি ১৯৮০ সনে মালাগালা সাহেবকে আরও পাঁচজন খোদ্দামের সাথে পাকিস্তান প্রেরণ করেন। তিনি ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর মাসে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ফাসলুল খাস শ্রেণীতে ভর্তি হন আর ১৯৮৮ সনের ১লা মার্চে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা জীবনের বরাতে তখনকার জামেয়ার অধ্যক্ষ সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব নিজের মন্তব্যে তার সম্পর্কে লিখে, মেধাগত দিক থেকে কিছুটা দুর্বল কিন্তু উত্তম সাহায্যকারী এবং অনুগত ছাত্র ছিলেন। নম্র স্বভাবী এবং ইবাদতগুজার ছিলেন। বুযূর্গদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদেরকে দোয়ার অনুরোধ করাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি কঠোর পরিশ্রমের সাথে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ সনে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে পাকিস্তান থেকে হিজরত করতে হয়, তখন এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দক্ষতা এবং সাহসিকতার সাথে ডিউটি প্রদানকারীদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমান অধ্যক্ষ মুবাশ্বের আইয়্যায সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, আমরা জামেয়াতে সহপাঠি ছিলাম। অনেক পুণ্যবান ও চুপচাপ স্বভাবের ছিলেন। জামেয়ার সেসব ছাত্রের মাঝে তাকে গণ্য করা হতো যাদের মাঝে ইবাদত এবং সাধনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। আনুগত্য তার বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেন, নকীব এবং যয়ীম হওয়ার কারণে তার সাথে বেশ কয়েকবার আমার কাজ করতে হয়েছে, তখন তাকে অত্যন্ত বিনয়ী এবং আদেশ পালনকারী ও অনুগত পেয়েছি। ফুটবলের অনেক শখ ছিল তার। দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিলেন আর বিশেষভাবে তাকে দলে নেওয়া হতো। জামেয়ার পড়াশোনা শেষ করার পর ১৯৮৮ সনে উগান্ডায় যথারীতি মুবাল্লিগ হিসেবে তার পদায়ন হয়, সেখানে তিনি বিভিন্ন জামা'তে মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করেন। ২০০৭ সনে উগান্ডার আরো দু'জন মুবাল্লিগের সাথে তিনি পাকিস্তানে যান, সেখানে তিনি উগান্ডার ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদের কাজ পরিমার্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর তিন মাসের মাঝে তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেন। জামেয়াতে অধ্যয়নকালে জ্ঞান বা মেধাগত দিক থেকে বাহ্যত কিছুটা দুর্বল হলেও পরবর্তীতে তিনি জ্ঞানের দিক থেকেও অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন, নিজের জ্ঞানকে অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন। মরহুমের তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল এবং তার তবলীগে বৃহৎ সংখ্যায় মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। সাইকেলে করেই অনেক দীর্ঘ তবলীগি সফর করতেন। এক তবলীগের সফরে থাকাকালে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয় কিন্তু তার সাথে যোগাযোগের কোন মাধ্যম ছিল না। তিনি

যখন তবলীগি সফর থেকে ফিরে আসেন তখন জানতে পারেন যে, স্ত্রী মারা গেছেন এবং তার দাফন কাফনও হয়ে গেছে। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থেকে পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহানুভূতিশীল এবং মহানুভব মানুষ ছিলেন। দরিদ্র এবং মিসকীনদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অনুগত ছিলেন। যুগ-খলীফার প্রতিটি নির্দেশ পালন করাকে আবশ্যক জ্ঞান করতেন। সাধারণত সকল আফ্রিকানই কিন্তু আফ্রিকান মুবাল্লিগ, বিশেষ করে ওয়াকফে যিন্দেগীদের আমি দেখেছি যে, খিলাফতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

উগান্ডার আমীর মোহাম্মদ আলী কায়েরে সাহেব লিখেন, মরহুম একজন আদর্শ মুরব্বী, অত্যন্ত নেক হৃদয়ের অধিকারী, তবলীগে আগ্রহী এবং ধর্মসেবায় রত একজন মানুষ ছিলেন। অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কখনও অভিযোগ করেন নি, বরং সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সেবায় রত ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং কিয়দকাল পরেই তৃতীয় বিয়ে করেন। তার এক স্ত্রী লিখেন, আমি তাকে সারা জীবন অত্যন্ত স্নেহশীল, নম্র হৃদয় এবং সকল অবস্থায় শান্ত ও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ দেখেছি। তার কন্যা লিখেন, আমাদের পিতা অনেক মহানুভব এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সর্বদা আমাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতেন আর ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিতেন। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন স্ত্রী এবং নয়জন সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়ার্দ্র হোন, তার প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তার বংশধরদেরকেও সর্বদা আহমদীয়াত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২-২৮ জুন ২০১৮, খণ্ডঃ ২৫, সংখ্যাঃ ২৫, পৃঃ ৫-৮)